ইউনিট
৩

বাংলাদেশের শিল্প
Industry of Bangladesh

ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। এদেশ মূলত: কৃষি নির্ভর। তাই অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন-যাপন করে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেবল কৃষির উপর নির্ভর করলে চলবে না। দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে কৃষির পাশাপাশি শিল্পে উন্নত হওয়ার কোন বিকল্প নেই। শিল্পোন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তাই বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন জরুরি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৩.১: বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

পাঠ ৩.২: বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেনিবিন্যাস

পাঠ ৩.৩: রপ্তানিমূখী শিল্প (পাঠ, বস্ত্র, চা, চামড়া, তৈরি পোশাক)

পাঠ ৩.৪: আমদানি বিকল্প শিল্প

পাঠ ৩.১ বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো
Structure of Industry of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। তবে কৃষি প্রধান হলেও শিল্পে গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এ দেশের কৃষিকাজ প্রাচীন ও অনুন্নত। একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও বেকারত্ব সহ সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষেত্রে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহ যেমন ইংল্যান্ড, কানাডা, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের উন্নয়নের মূলে রয়েছে দ্রুত শিল্পয়ান। বাংলাদেশের শিল্পের আকার ও গঠন কাঠামো নিচে ব্যাখ্যা করা হল:

(ক) আকার অনুযায়ী শিল্পের শ্রেণীবিভাগ (Classification of industry according to size): বাংলাদেশের শিল্পসমূহ আকার অনুযায়ী বা আকারের ভিত্তিতে মূলত তিন প্রকার। নিচে এগুলো ব্যাখ্যা করা হল:

১। বৃহৎ শিল্প (Large scale industries): বৃহৎ শিল্প বলতে বড় শিল্প বোঝায় অর্থাৎ যে শিল্পে অধিক মূলধন, অনেক শ্রমিক ও প্রচুর পরিমান কাঁচামাল ব্যবহার করে আধুনিক তথা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয় তাকে বৃহৎ অথবা বৃহদায়তন শিল্প বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য বাংলাদেশ শিল্প আইন অনুযায়ী যে শিল্প কারখানায় ২৩০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে তাকে বৃহৎ শিল্প বলে। পাট, বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, সার ইত্যাদি বাংলাদেশের শিল্পের উদাহরণ।

২। মাঝারি শিল্প (Medium scale industries): বাংলাদেশে শিল্প আইন বা কারখানা আইন অনুযায়ী যে কারখানায় ২০ জনের বেশি কিন্তু ২৩০ জনের কম শ্রমিক নিয়োজিত আছে তাকে মাঝারি শিল্প বলে। মাঝারি শিল্প মূলত: বৃহৎ ও ক্ষুদ্রশিল্পের মাঝামাঝি অবস্থান করে। মাঝারি শিল্প, বৃহৎ শিল্পের ন্যায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তবে মূলধন তুলনামূলক ভাবে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা কম ব্যবহার করে। বাংলাদেশে বহু সংখ্যক মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চামড়া শিল্প, সিগারেট শিল্প, সাবনশিল্প, দিয়াশলাই শিল্প ইত্যাদি।

৩। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (Small and cottage industries): সাধারণ অর্থে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প একই অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে সুক্ষ্ম অর্থে এ দুয়ের পার্থক্য আছে। বাংলাদেশে কারখানা ও শিল্প আইন অনুযায়ী যে কারখানায় সর্বোচ্চ ২০ জন শ্রমিক কাজ করে তাকে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প বলে। তবে এখানে উল্লেখ্য ক্ষুদ্র শিল্পে ভাড়া করা শ্রমিক ও বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে উন্নত প্রযুক্তিও ব্যবহার হয়।

কুটির শিল্প মূলত পারিবারিক শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় না। মোট কথা স্থানীয় কাঁচামাল কম মূলধন ও পারিবারের সদস্য দ্বারা কুটির শিল্প বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশে তাত শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, বিড়ি শিল্প, লবন শিল্প ইত্যাদি হল কুটির শিল্প।

(খ) কাঠামো অনুযায়ী শিল্পের শ্রেণী বিভাগ (Classification of industry according to structure): কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলো ব্যাখ্যা করা হল:

১। ভোগ্য দ্রব্য শিল্পঃ সে সব শিল্পকারখানা সরাসরি মানুষের ভোগ উপযোগী দ্রব্য তৈরি করে তাকে ভোগ্য দ্রব্য শিল্প বলে। যেমন- সাবান শিল্প,চিনি শিল্প, সিগারেট শিল্প ইত্যাদি। বাংলাদেশ একটি অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ। তাই এখানে ভোগ্য শিল্পের গুরুত্ব অত্যাধিক।

২। মাধ্যমিক দ্রব্য শিল্পঃ যে সকল উৎপাদিত পণ্য পুনরায় অন্য দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে মাধ্যমিক দ্রব্য বলে। আর এই মাধ্যমিক দ্রব্য যে সকল কারখানায় তৈরি হয় তাকে মাধ্যমিক দ্রব্য শিল্প বলে। যেমন- সুতা একটি উৎপাদিত দ্রব্য যা বস্ত্র শিল্পে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই সুতা শিল্পকে মাধ্যমিক শিল্প বলে।

৩। মূলধনী দ্রব্যের শিল্পঃ বাংলাদেশে মূলধনী বা ভারী শিল্প নেই বললেই চলে। তবে একটি দেশের অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করতে হলে অবশ্যই প্রয়োজন মূলধনী শিল্প। মূলধনী দ্রব্য যে কারখানায় তৈরি হয় তাকে মূলধনী শিল্প বলে। যেমন- জয়দেবপুর মেশিন ও টুলস ফ্যাক্টারী, চিটাগাং স্টিল মিল ইত্যাদি।

বাংলাদেশে শিল্পের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে শিল্পসমূহের কাঠামোগত বৈশিষ্টগুলো নিচে ব্যাখ্যা করা হল।

১। বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্যঃ বাংলাদেশের শিল্পখাতে প্রধান শিল্প হল বস্ত্র শিল্প। বস্ত্র শিল্প আমাদের বস্ত্রের অভ্যন্তরীন চাহিদার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মিটাতে সক্ষম। মূল্য সংযোজনের বিচারে বৃহত্তম দশটি শিল্পের মধ্যে পাঁচটি বস্ত্র শিল্প। এ বস্ত্র শিল্প দ্বারা মোট শিল্পখাতে মূল্য সংযোজনের ৪৪% এবং কর্মসংস্থানের ৪৫% সৃষ্টি হয়। আমাদের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র শিল্প হল হ্যান্ডলুম পাট বস্ত্র, তৈরি পোশাক এবং বুনন ও হোসিয়ারি বস্ত্র শিল্প।

২। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের প্রাধান্যঃ বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূল্য সংযোজনে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। শিল্পখাতে মোট কর্মসংস্থানের এক চতুর্থাংশ থেকে বেশি কর্মসংস্থান হস্তচালিত তাঁত শিল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

৩। পাট বস্ত্র শিল্পের গুরুত্বঃ বাংলাদেশে বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে অন্যতম প্রধান শিল্প হল পাট ও বস্ত্র শিল্প। পাট সরকারি রাজস্বের একটি অন্যতম উৎস। বৃহদায়তন শিল্প উপখাতে মূল্য সংযোজনের এক চতুর্থাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানের এক-তৃতীয়াংশ থেকে বেশি পাট বস্ত্র শিল্পে হয়ে থাকে। ২০০০-২০০১ সালের প্রথম নয় মাসে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশের আয়ের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ মার্কিন ডলার।

৪। দ্বৈততাঃ বাংলাদেশের শিল্পকাঠামোতে এক ধরনের দ্বৈততা বিরাজ করছে। বৃহদায়তন শিল্প অধিক মূল্য সংযোজন করলেও কর্মসংস্থান যোগাচ্ছে কম। আবার, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলো কর্মসংস্থান বেশি সৃষ্টি করলেও মূল্য সংযোজন করছে কম।

৫। পোশাক শিল্পের দ্রুত প্রসারঃ পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে। স্বাধীনতার পর এ শিল্পটির ব্যাপারে প্রথমে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে। এ সব কারখানায় প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। বর্তমানে এটি বৃহত্তম রপ্তানী মূখী শিল্প।

৬। শ্রমঘন শিল্পের প্রধান্যঃ বাংলাদেশের সার ও পেট্রোলিয়াম শোধন শিল্প ছাড়া অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শ্রমঘন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আমাদের শিল্পখাত মূলত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। ভারি শিল্পের অভাবে বাংলাদেশে মূলধন নিবিড় প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই কম।

৭। কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ বাংলাদেশে বৃহদায়তন শিল্পে দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের সিংহভাগ উৎপাদিত হলেও এখানে কর্মসংস্থানের পরিমান কম। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদনের পরিমান কম হলেও কর্মসংস্থানের পরিমান বেশি। দেশের শ্রম শক্তির প্রায় ৮৭ শতাংশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। যদিও এখানে মোট উৎপাদন ক্ষমতা বাংলাদেশের মোট শিল্পোৎপাদনের ১৮ শতাংশ মাত্র।

পরিশেষে বলা যায় যে বাংলাদেশের মোট শিল্পকাঠামো খুবই দূর্বল। আমরা এখানে শ্রম নিবিড় প্রযুক্তির সাহায্যে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছি। তাই শিল্প উন্নয়নের গতিকে তরাণ্বিত করার জন্য আমাদের শ্রম নিবিড় পন্য উৎপাদনের পাশাপাশি মূলধন নিবিড় পন্য উৎপাদনে এগিয়ে আসছে। কেননা স্বনির্ভর শিল্পোন্নয়নের জন্য ভারী শিল্পের উন্নয়ন একটি অপরিহার্য শর্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাংলাদেশে শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।	

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান হলেও শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। কারন এ দেশের কৃষিকাজ প্রাচীন ও অনুন্নত। বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে আকারের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ক) বৃহৎ শিল্প খ) মাঝারি শিল্প ও গ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বৃহৎ শিল্পে কতজনের অধিক শ্রমিক কাজ করে?
ক) ২৫০ খ) ৩০০ গ) ২০০ ঘ) ২৩০

২। কোনটি মাঝারি শিল্পের উদাহরণ?
ক) পাট শিল্প খ) বস্ত্র শিল্প গ) সিগারেট শিল্প ঘ) তাঁত শিল্প

৩। সুতা শিল্প কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত?
ক) ভোগ্য দ্রব্য শিল্প খ) মূলধনী দ্রব্যের শিল্প গ) মাধ্যমিক দ্রব্য শিল্প ঘ) প্রাথমিক দ্রব্য শিল্প

৪। বর্তমানে বাংলাদেশে বৃহত্তম রপ্তানীমুখী শিল্প কোনটি?
ক) সাবান শিল্প খ) ঔষধ শিল্প গ) সিরামিক শিল্প ঘ) পোষাক শিল্প

৫। কাঠামো অনুযায়ি বাংলাদেশের শিল্পকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) দুই ভাগে খ) তিন ভাগে গ) চার ভাগে ঘ) পাঁচ ভাগে

পাঠ ৩.২ বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেনীবিন্যাস
Classification of Industries in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্প,ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের অবস্থান ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্প,ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের অবস্থান ও ভূমিকা

বাংলাদেশে শিল্প কাঠামোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে,আমাদের শিল্পখাতে তিনটি উপখাত রয়েছে, যথা-(১) বৃহৎ শিল্প (২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও (৩) কুটির শিল্প।

নিম্নে বাংলাদেশে শিল্পখাতে এই তিন ধরনের শিল্পের অবস্থান ও এদের পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হল:

১। বৃহৎ শিল্পঃ বাংলাদেশ শিল্প আইন অনুযায়ী যে শিল্প করখানা ২৩০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে তাকে বৃহৎ শিল্প বলে। অন্যদিকে দেশের ২০০৫ সনের শিল্পনীতিতে সে সমস্ত শিল্পের জমি এবং স্থায়ীভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য মোট স্থায়ী বিনিয়োগ ১০ কোটি টাকার বেশি তাদেরকে বৃহদায়তন শিল্প বলা হয়েছে। বৃহৎ শিল্প কারখানায় দক্ষ শ্রমিক, প্রচুর মূলধন ও জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিপুল পরিমাণের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়।

মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের অবদানঃ মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সর্বাধিক। বাংলাদেশে শিল্পখাতে বার্ষিক গড়ে চলতি মূল্যে যে পরিমান মূল্য সংযোজিত হয় তার প্রায় ৪৮ শতাংশ বৃহদায়তন শিল্প থেকে পাওয়া যায়। তবে বৃহৎ শিল্পে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ সর্বাধিক হলেও এই উপখাতে কর্মসংস্থানের পরিমান তুলনামূলক ভাবে কম। বাংলাদেশের শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির মাত্র ১৩ শতাংশ বৃহৎ শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

২। মাঝারি শিল্পঃ ২০০৫ সনের শিল্পনীতিতে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি এবং স্থায়ীভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য মোট স্থায়ী বিনিয়োগ অনুর্ধ্ব ১.৫০ কোটি টাকা হতে ১০ কোটি টাকা সেগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। সিরামিক অটোমোবাইলসহ হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিল্ক শিল্প, কোল্ড স্টোরেজ, ফার্ণিচার, ইত্যাদি মাঝারি শিল্পের অন্তর্গত।

৩। ক্ষুদ্র শিল্পঃ বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুযায়ী যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমান অনুর্ধ ১০ লক্ষ টাকা সেগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। ২০০৫ সনের শিল্পনীতি অনুযায়ী যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য/প্রতিস্থাপন ব্যয় অনধিক ১.৫০ কোটি টাকা। সে গুলোকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। ছোট ছোট ফ্যাক্টারিতে ক্ষুদ্র শিল্পের কাজ চলে এবং সেখানে হাল্কা যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। হোসিয়ারী শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, দেশলাই শিল্প ইত্যাদি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ।

মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদানঃ মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। দেশের শিল্পখাতে বার্ষিক গড়ে চলতি মূল্যে যে পরিমান মূল্য সংযোজিত হয় তার প্রায় ৩৫ শতাংশ এই শিল্প থেকে পাওয়া যায়। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এই উপখাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির প্রায় ২৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

৪। কুটির শিল্পঃ সাধারণত মালিকের গ্রামেই স্থাপিত হয় এবং পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে এর উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯১ সনের শিল্প নীতিতে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমান অনুর্ধ্ব ৫ লক্ষ টাকা সেগুলোকে কুটির শিল্প বলে। হস্ত চালিত তাঁত শিল্প,খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, মৃৎ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, বিড়ি শিল্প প্রভৃতি আমাদের কুটির শিল্পের উদাহরণ।

মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের অবদানঃ মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের অবদান সর্বনিম্ন। বাংলাদেশে শিল্পখাতে বার্ষিক গড়ে চলতি মূল্যে যে পরিমান মূল্য সংযোজিত হয় তাতে কুটির শিল্পের অবদান মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু কর্মসংস্থান এর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে শিল্পখাতে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৬১ শতাংশ কুটির শিল্পে নিয়োজিত।

বাংলাদেশে শিল্পখাতে বৃহৎ,ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং কুটির শিল্পের উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, এ দেশে শিল্প খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সিংহভাগ কুটির শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। অথচ মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের অবদান সবচেয়ে কম। পক্ষান্তরে মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ বৃহৎ শিল্পে কর্মসংস্থানের পরিমান সবচেয়ে কম। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের শিল্পখাত একধরনের দ্বৈত চরিত্রের অধিকারী।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের শিল্পখাতে কুটির শিল্প একটি অত্যন্ত পরিচিত শিল্প। নানা দিক থেকে এ শিল্প এদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১। কর্মসংস্থানের সূযোগঃ বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রচ্ছন্ন ও ঋতুগত বেকার সমস্যা প্রকট। গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এ সমস্যার অনেকটা সুরাহা সম্ভব।

২। নারীদের জন্য কর্মসংস্থানঃ বাংলাদেশে বেশির ভাগ মহিলা পর্দানশীল বলে ঘরের বাইরে কাজ করতে ইচ্ছুক নয়। কুটির শিল্প প্রসারের মাধ্যমে এসব নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

৩। আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাঃ কুটির শিল্প স্বল্প মূলধন, সহজলভ্য কাঁচামাল, সাধারণ যন্ত্রপাতি দ্বারা স্বউদ্যোগে গ্রামে প্রতিষ্টা করা যায়। তাই এ দেশে বেশির ভাগ আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমেই করা যায়।

৪। অতিরিক্ত আয় অর্জনঃ বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ লোকেরই আয় অল্প। কুটির শিল্প সংস্থাপনে উৎসাহিত করে গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

৫। কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাসঃ বাংলাদেশে কৃষি বহির্ভূত কাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম বলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ রয়েছে। কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এ ধরনের চাপ কমানো যায়।

৬। উপজাত দ্রব্যের ব্যবহারঃ বৃহৎ শিল্পের অনেক পরিত্যক্ত উপজাত দ্রব্য কাঁচামাল হিসেবে কুটির শিল্পে ব্যবহৃত হয়। দেশে অধিক সংখ্যায় কুটির শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে উপজাত দ্রবাদির সদ্ব্যবহার সম্ভব।

৭। দেশজ কাঁচামালের ব্যবহারঃ বাংলাদেশে পাঁট, বাঁশ, বেত, চামড়া, কাঠ, তামাক ও অন্যান্য দ্রব্য যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যায়। এ সব উপকরণের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানো প্রয়োজন।

৮। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নঃ কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র লোকদের আয় বাড়বে। তখন তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে।

৯। ভোক্তাদের বহুমুখী চাহিদা পূরণঃ এদেশের কুটির শিল্প গুলো বিভিন্ন রকম ব্যবহার্য তৈরি করে ভোক্তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে পারে। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রাও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়।

১০। কর্মমূখী পরিবেশ সৃষ্টিঃ কৃষি-বহির্ভূত কাজ হিসেবে সারা বছর কুটির শিল্পের কর্মকান্ড পরিচালিত হলে গ্রামীণ জনগনের মধ্যে কর্মমূখি মনোভাব সৃষ্টি হয়। এর ফলে সেখানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাড়বে।

১১। দারিদ্র্য লাঘবঃ পল্লী অঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসার ঘটলে পরিবারের আয় বাড়বে এবং এর ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্যের মাত্রা কমবে।

১২। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশঃ বাংলাদেশে কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটলে অকৃষি খাতে উপাদান ও আয় বাড়বে। এর ফলে গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে।

১৩। জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণঃ বাংলাদেশে বংশানুক্রমে লালিত অনেক জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা কুটির শিল্পের দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও লালন করা হয়ে থাকে। এজন্যে এ ধরনের শিল্প বেশি করে গড়ে ওঠা দরকার।

উপরের আলোচনার আলোকে এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৪। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনঃ বিদেশে বাংলাদেশের কুটির শিল্পজাত সৌখিন দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। কুটির শিল্পের মাধ্যমে এসব দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াতে পারলে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

১৫। সুষম উন্নয়নঃ বৃহৎ বৃহৎ শিল্প শহর কেন্দ্রিক হয় বলে শহরাঞ্চলেই উন্নয়ন বেশি। এ জন্য কুটির শিল্প গ্রামাঞ্চলে প্রসার লাভ করলে দেশে সুষম উন্নয়ন ঘটে।

১৬। মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাসঃ বাংলাদেশে বর্তমানে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান। এ অবস্থায় কুটির শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের যোগান বাড়লে তা মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাসের সহায়ক হবে।

১৭। পরিবেশ দূষণ রোধঃ কুটির শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের মতো ধোয়া ও বর্জ্য পদার্থ ছড়ায় না। এর ফলে এ শিল্প পরিবেশ দূষিত করে না।

১৮। আয়ের সুষম বন্টনঃ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় আয়ের প্রকট বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কুটির শিল্প প্রসারের মাধ্যমে দরিদ্র লোকদের আয় বাড়লে আয়ের বৈষম্য কিছুটা হলেও কমবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকাঃ

জনবহুল ও স্বল্প আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব বা সুবিধা আপেক্ষিকভাবে বেশি। এ দেশে বিপুল পুঁজি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃহৎ শিল্পের দ্বারা যে মূল্য সংযোজন ও কর্মসুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের মাধ্যমে তার চেয়ে বেশি সুবিধা পাওয়া সম্ভব বলে মনে করা হয়। এ জন্য সাম্প্রতিক শিল্পনীতিতে দেশে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব বা সুবিধা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যায়:

১। উপজাত দ্রব্যের ব্যবহারঃ বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র শিল্পে গড়ে উঠলে বৃহৎ শিল্পের কিছু কিছু উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার সম্ভব হয়।

২। মহিলাদের জন্য কর্মসূযোগঃ বিশেষ ধরনের দক্ষতার অভাবে বড় শিল্পে নারীদের কর্মসংস্থানের সূযোগ সীমিত। এক্ষেত্রে দেশের সর্বত্র শিল্প গড়ে উঠলে দক্ষ ও কম দক্ষ নারীদের জন্য কর্মসুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

৩। দেশজ কাঁচামালের ব্যবহারঃ বাংলাদেশে ফলমূল, পাট, চামড়া, চা, কাঠ ও অন্যান্য উপকরণ প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে এসব দেশজ কাঁচামালের উপযুক্ত ব্যবহার করা যায়।

৪। কৃষি-বহির্ভূত খাতে কর্মসূযোগঃ বাংলাদেশে কৃষি-বহির্ভূত খাত হিসেবে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র শিল্পে অনেক রকম পণ্য উৎপাদন করা যায়। ফলে এক দিকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়এবং অন্যদিকে কৃষিখাত থেকে শিল্পখাতের অতিরিক্ত শ্রমশক্তির স্থানান্তর ঘটে।

৫। শ্রম ঘন উৎপাদনঃ ক্ষুদ্র শিল্পে শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। তাই এ শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি।

৬। ধন বৈষম্য হ্রাসঃ ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটলে দেশের শিল্প মালিকানায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। ফলে দেশে আয় ও সম্পদ বন্টনের অসমতা কিছুটাও হলেও কমতে পারে।

৭। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নঃ কোনো কোনো বৃহৎ শিল্পের কিছু কিছু উপকরণ ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে ব্যবহারযোগ্য বোতাম, সুতা, লেবেল, কার্টুন, প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরি হয়।

৮। আমদানি নির্ভরতা হ্রাসঃ ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যপক প্রসার ঘটলে বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার ভোগ্য পণ্যের চাহিদা পূরণ হবে। ফলে আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৯। ভোক্তাদের বহুমুখী চাহিদা পূরণঃ বিভিন্ন রকম ক্ষুদ্র শিল্পে যে বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদিত হয় তা ভোক্তাসাধারণের বৈচিত্র্যপূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

১০। শ্রমিকের সহজপ্রাপ্যতাঃ অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্পে অত্যাধুনিক ও জটিল যন্ত্রপাতির ব্যবহার থাকে না। তাই এসব শিল্পে দেশের সহজলভ্য শ্রমিক সহজেই নিয়োগ করা যায়।

এসব কারণে দেশের সমগ্র শিল্প কাঠামোর মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৃহৎ শিল্পের ভূমিকাঃ বৃহৎ ও যন্ত্র শিল্পের উন্নয়ন শিল্পায়নের অন্যতম প্রধান সূচক। উন্নত দেশগুলোর ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে বৃহৎ শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ বাংলাদেশের শিল্পখাতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বৃহৎ শিল্পের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা নিচে আলোচিত হলো:

১। কর্মসংস্থান বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশে কৃষি খাতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লোক নিয়োজিত রয়েছে। এ অবস্থায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্যে বৃহদায়তন কলকারখানাই এক মাত্র ভরসা।

২। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: বাংলাদেশে পাট, আখ, চা, চামড়া, গ্যাস, চুনাপাথর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সামগ্রী পাওয়া যায়। এগুলো বড় শিল্পকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হলে তার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হবে।

৩। রপ্তানি বৃদ্ধি: বাংলাদেশে বৈদেশিক বানিজ্যের ঘাটতি দূর করার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি করা দরকার। এ জন্য বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন বিশেষ করে রপ্তানীমুখী বড় শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায়।

৪। কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস: বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পগুলোতে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করতে পারলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৫। কৃষি উন্নয়ন: কৃষি খাতের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্যে ট্রাক্টর, হারভেস্টর, গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং রাসায়নিক সার কীটনাশক ইত্যাদি উপকরণ দরকার হয়। বৃহৎ শিল্পের মাধ্যমেই এগুলো উৎপাদন সম্ভব।

৬। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি: বৃহৎ শিল্প তুলনামূলক ভাবে অধিক উৎপাদনশীল। তাই বাংলাদেশে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষির পাশাপাশি বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

৭। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা: দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য লোহা ও ইস্পাত, মেশিনটুল, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি ভারী শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা কেবল বৃহদায়তন শিল্পোন্নায়নের মাধ্যমেই করা যায়।

৮। অবকাঠামো উন্নয়ন: দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপিত হলে রেলপথ, রাস্তাঘাট, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়বে।

৯। দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টি: বাংলাদেশে দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দেশে বৃহৎ শিল্পের প্রসার ঘটলে উদ্যোক্তাগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে যারা শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

১০। অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: কৃষিজাত দ্রব্যের দাম কম হয় বলে তা রপ্তানি করে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় না। অন্যদিকে বৃহদায়তন শিল্পের দ্রব্য রপ্তানি করে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

১১। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: বাংলাদেশে ভারি ও বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম উৎপাদন করা যাবে।

১২। আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন: এ দেশে বড় শিল্প কারখানর সংখ্যা বাড়লে সমাজে বাস্তবমূখী ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হবে।

১৩। পরনির্ভরতা হ্রাস: বাংলাদেশে বৃহৎশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ভোগ্য ও পুঁজি দ্রব্যের যোগান বাড়বে। এর ফলে বিদেশের ওপর আমাদের নির্ভরতা কমবে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ১০৮.৭৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের গড় সূচক দাড়ায় ২১১.২৯। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ উৎপাদনসূচক দাড়িয়েছে ২৩১.৮৩। সারণি ৮.২-এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হয়েছে:

২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক

মাঝারি থেকে	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	১০৮.৭৬	১১৭.৫০	১২৭.৪৭	১৩৫.০১	১৫৭.৮৯	১৭৪.৯২	১৯৫.১৯	২১১.২৯	২৩১.৮৩

শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্প,ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের অবস্থান ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে শিল্পখাতে বৃহৎ,ক্ষুদ্র ও মাঝারি, কুটির শিল্পের অবস্থানের বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে এ দেশে শিল্প খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি সিংঘভাগ কুটির শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। অথচ মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ বৃহৎ শিল্পে কর্মসংস্থানের পরিমান সবচেয়ে কম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কত সালে শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়?

ক) ১৯৯০ খ) ১৯৯১ গ) ১৯৭৬ ঘ) ১৯৮৯

২। কোনটির বিকাশ ঘটলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে?

ক) বৃহৎ শিল্প খ) মাঝারি শিল্প গ) কুটির শিল্প ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প

৩। বৃহৎ শিল্পের কিছু কিছু উপকরণ কোন শিল্পে উৎপন্ন হয়?

ক) কুটির শিল্প খ) ক্ষুদ্র শিল্প গ) মাঝারি শিল্প ঘ) ভারী শিল্প

৪। বাংলাদেশের শিল্পখাতে কয়টি উপখাত রয়েছে?

ক) ২টি খ) ৪টি গ) ৩টি ঘ) ৫টি

৫। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের বিশেষ ভূমিকাগুলো কি কি?

i. কর্মসংস্থানের সুযোগ
ii. নারীদের জন্য কর্মসংস্থান
iii. আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাঝারি শিল্পের বিশেষ ভূমিকাগুলো কি কি?

i. উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার
ii. দেশজ কাঁচামালের ব্যবহার
iii. শ্রমঘন উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৩.৩ রপ্তানিমূখী শিল্প (পাঠ, বস্ত্র, চা, চামড়া, তৈরি পোশাক)
Export Oriented Industry (Jute, Cloths, Tea, Leather, Readymade Garments)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানিমূখী শিল্পসমূহের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে এ সব শিল্পসমূহের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে এবং সামাধানের উপায় বের করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানিমূখী শিল্পসমূহের গুরুত্ব

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। রপ্তানিমূখী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌছতে পারে। নিম্নে বাংলাদেশে রপ্তানিমূখী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল:

১। দেশীয় শিল্পের প্রসার: রপ্তানিমূখী শিল্পের দ্রব্যসমূহের বাজার হলো আন্তর্জাতিক বাজার। এই দ্রব্যসমূহের ক্রেতারসংখ্যা থাকে অনেক। এত একদিকে যেমন তাদের উৎপাদন ব্যয়ের সাশ্রয় হয় অন্যদিকে বিক্রয়ও অনেক বেশি হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রপ্তানিমূখী শিল্পের ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটে।

২। দক্ষতা বৃদ্ধি: রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতার লিপ্ত হয়। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

৩। সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার: বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম হলেও আমাদের রয়েছে শিল্পোৎপাদন উপযোগী প্রচুর কাঁচামাল। কিন্তু মূলধনের অভাবে আমাদের দেশে সম্পদের পূর্ণব্যবহার সম্ভব হয় না। বিদেশি সহায়তায় দেশে রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হলে আমাদের দেশীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৪। বেকার সমস্যা হ্রাস: বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। দেশীয় সম্পদে ব্যবহার করে এদেশে শ্রমবহুল রপ্তানিমূখী শিল্পোৎপাদন শুরু করলে দেশে বেকার সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

৫। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস: রপ্তানিমূখী শিল্পের ক্ষেত্রে যে দেশ যে শিল্প উৎপাদনে কাঁচামাল শ্রমিক ইত্যাদি দিক থেকে অধিকতর সুবিধা ভোগ করে সে দেশ সেই শিল্প উৎপাদন করে। এতে শিল্পোৎপাদনের ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পায়।

৬। বৈদেশিক ঋণের বোঝা হ্রাস: বাংলাদেশ ঋণভারে জর্জড়িত একটি দরিদ্র দেশ। দেশে রপ্তানিমূখী শিল্পোৎপাদন করা সম্ভব হলে আমাদের বৈদেশিক ঋণের বোঝা হ্রাস করা সম্ভব হবে।

৭। কৃষি উন্নয়ন: আমাদের দেশের বাজার সীমিত বিধায় কৃষকগণ শিল্পের কাঁচামাল বিক্রয় করে খুব একটা লাভবান হয় না। এছাড়া এ ধরনের কাঁচামালের রপ্তানির বাজার সবসময় ওঠানামা করে। কিন্তু দেশে রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হলে আমাদের কৃষক তাদের উৎপাদিত কাঁচামাল বিক্রয়ের নিশ্চয়তা পাবে। এতে কৃষির উন্নয়ন হবে।

রপ্তানিমূখী শিল্প ব্যবস্থার অসুবিধা

বাংলাদেশে রপ্তানিমূখী শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রেও কতিপয় অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হল:

১। আমদানি বিকল্প শিল্পের সমস্যা: দেশে রপ্তানানিমুখী শিল্প ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে অনেক সময় বানিজ্যিক উদারীকরণনীতি অনুসরণ করা হয়। আর উন্নয়নশীল দেশে বানিজ্য উদারীকরণ নীতি চালু থাকলে আমদানি শিল্পের যথাযথ

বিকাশ ঘটে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানিমূখী শিল্প ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহ সমস্যার সম্মুখীন হয়।

২। বহুজাতিক সংস্থাসমূহের শোষণের স্বীকার: উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানিমূখী শিল্প সংস্থাপন করা হলে অনেক ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর শোষণের শিকার হওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলো রপ্তানিমূখী শিল্প সংস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় বাজার ব্যবস্থা বা ঋণগ্রহন ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর শরণাপন্ন হয়ে থাকে।

৩। উন্নত দেশসমূহের কঠোর নীতি: বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীলদেশের রপ্তানি শিল্পজাত দ্রব্য সমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো প্রায় ক্ষেত্রে কঠোর নীতি গ্রহন করে থাকে। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের উপর কোটা আরোপের ফলে আমাদের এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। উন্নত দেশসমূহের এ ধরনের কঠোর নীতি গ্রহনের ফলে রপ্তানিমূখী শিল্প আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারে না।

৪। আয় বৈষম্য বৃদ্ধি: মুষ্টিমেয় শিল্পপতি মালিকানাধীন রপ্তানিমূখী শিল্পগুলোর কর অবকাশ,ভর্তূকি ,শিল্প ঋণ,মূলধন দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে বহুবিধ সুবিধা ভোগ করে। এতে করে ঐশ্রেণির শিল্পপতিগণ প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে যান।

৫। শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি: সাধারণত যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে অধিকতর সুবিধা ভোগ করে সে দেশ সে দ্রব্য অধিক পরিমানে উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশ একটি অতি জনবহুল দেশ। সুতরাং বাংলাদেশে শ্রমনিবিড় শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধা রয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব। ফলে আমাদের শ্রমঘন শিল্পগুলো প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিকভাবে ততটা লাভজনক হতে পারে না। এটি আমাদের দেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের পথে অন্যতম সমস্যা।

বাংলাদেশে কিছু প্রধান শিল্পের সমস্যা:

ক) পাট শিল্পের সমস্যা: বাংলাদেশের পাট শিল্প বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। এ সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

১। পাটের গুনগত মান ও চাহিদার উত্থান-পতন: বাংলাদেশে কাঁচা পাটের গুনগতমানের তারতম্য ঘটে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজারে পাটের চাহিদার উত্থান পতনের জন্য এর উৎপাদন ও বন্টনে অনিশ্চয়তা দেখা যায়।

২। উৎপাদন ও মূল্য নির্ধারণ সমস্যা: কাঁচা পাটের উৎপাদন ও দাম নিধারণ ক্ষেত্রে জটিলতা ও অনিশ্চয়তা থাকে। ফলে পাটকলগুলোতে কাঁচা পাটের নিয়মিত যোগান ব্যাহত হয়। নানা কারনে পাঠজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। মজুত ও সংরক্ষণের সমস্যা: বাংলাদেশে পাটের প্রাথমিক বাজারগুলোতে গুদামঘরের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এজন্য কাঁচা পাট মজুত ও সংরক্ষণ করা যায় না। ফলে পাট শিল্পে কাঁচা পাটের নিয়মিত সরবরাহ বিঘ্নিত হয়।

৪। বিকল্প দ্রব্য ও প্রতিযোগীতা: সাম্প্রতিককালে দেশে ও বিদেশে পাটের বিকল্প হিসেবে কেনাফ, মেশতা, সিসাল প্রভৃতি কৃত্রিম আঁশের প্রচলন হয়েছে। তাছাড়া পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এখন ভারত, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল ও মায়ানমার প্রভৃতি দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে।

৫। বাজার তথ্যের অভাব: কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজার বিষয়ক সঠিক ও সমন্বিত তথ্য সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই।

৬। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী: বাংলাদেশে পাটের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপারী, ফড়িয়া, আড়তদার ইত্যাদি বহু ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের কারণে পাটচাষীরা পাটের উপযুক্ত দাম পায় না বলে পাট চাষে তাদের উৎসাহ কমে যায়।

৭। শ্রম অসন্তোষ : দেশের পাটকলগুলোতে শ্রমিকদের জন্য সার্বিক সুযোগ সুবিধা ও দাবি দাওয়া নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শ্রমিক কর্মচারী থাকায় তা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করে।

৮। নিম্ন ক্ষমতায় উৎপাদন: কাঁচা পাটের অনিয়মিত যোগান, যন্ত্রাংশের অভাব, বিদ্যুৎ ঘাটতি প্রভৃতি কারণে অধিকাংশ পাটকলগুলো নির্ধারিত ক্ষমতার অনেক নিচে উৎপাদন করে।

খ) বস্ত্র শিল্পের সমস্যা:

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের প্রধান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

১। দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত তুলা দুই-ই নিম্নমানের।

২। পর্যাপ্ত পরিমানে সুতা কলের অভাব।
৩। পর্যাপ্ত কাঁচামাল অর্থাৎ তুলার অভাব।
৪। উৎপাদিত সুতা ও কাপড় ত্রুটিপূর্ণ দাম নির্ধারণের জন্য মিলগুলো বানিজ্যিক সফলতা ব্যাহত হয়।
৫। উৎপাদিত কাপড়ের মান নিচু হওয়ায় তার চাহিদা কম। দেশের পোশাক শিল্পে এ কাপড় ব্যবহৃত হয় না।
৬। বস্ত্রকলগুলোর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির অভাব। বিদ্যুৎ ঘাটতি ও শ্রম অসন্তোষ বিরাজমান।
৭। বস্ত্রকলগুলো তাদের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না।
৮। রাষ্ট্রায়াত্ত বস্ত্রকলগুলোর ব্যবস্থাপণায় অদক্ষতা বিদ্যমান।
৯। আমদানি কৃত কাপড়ের সাথে অসম প্রতিযোগিতার ফলে দেশের বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।
১০। বস্ত্রশিল্পের ঋণের যোগান অপ্রতুল।
১১। বস্ত্রকলগুলো উৎপাদন ক্ষমতা কম।

গ) চা শিল্পের সমস্যাঃ

বাংলাদেশের চা শিল্পের নিম্নোক্ত কতগুলো সমস্যা রয়েছে:

১। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবঃ চা কারখানায় ব্যবহারের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির অভাব রয়েছে।
২। দক্ষশ্রমিকের অভাবঃ এদেশে চা শিল্পের কাজ করার মতো দক্ষ শ্রমিকের অভাব রয়েছে।
৩। পুঁজির অভাবঃ চা শিল্পের বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব রয়েছে।
৪। প্যাকিং ও গদামজাতকরণের সমস্যাঃ উৎপাদিত চা প্যাকিং ও সংরক্ষনের যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই।
৫। কীটনাশক ঔষধের অভাবঃ প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশক ঔষধের অভাবে চা উৎপাদন ব্যহত হয়।
৬। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার অভাবঃ উন্নত ও পর্যাপ্ত পরিবহন সুবিধার অভাবে চা এর বাজারজাতকরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়।
৭। পরিবর্তক দ্রব্যের প্রচলনঃ চা এর পরিবর্তক দ্রব্য কফির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ব বাজারে চা রপ্তানি প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ছে।
৮। অনিশ্চিত চাহিদাঃ ভারতের দার্জিলিং এর চায়ের সাঙ্গে এ দেশের চ তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এ জন্য এদেশের চা শিল্পে অনেক সময় অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।
৯। চা বাগানের অদক্ষ ব্যবস্থাপনাঃ আমাদের দেশে অনেক চা বাগান রয়েছে যেখানে উদ্যোক্তা ও মালিকের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহন করা হয় না।
১০। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতঃ চা-এর উৎপাদন বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের জন্য দেশে চা এর উৎপাদন ব্যহত হয়।

ঘ) চামড়া শিল্পের সমস্যাঃ

এদেশের চামড়া শিল্প একটি উদীয়মান রপ্তানিমুখি শিল্প। বহুকাল ধরে এ শিল্পটি টিকে থাকলেও এখানে চামড়া জাতীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন তেমন বাড়েনি। প্রক্রিয়াজাত চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদির যে আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে সেখানে এদেশের চামড়া শিল্পের অবদান আশানুরূপ নয়। এ শিল্প উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সমস্যা গুলো দায়ী:

১। চামড়া সংরক্ষণের অসুবিধাঃ দেশে প্রতন্ত্য অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত কোথাও কাঁচাচামড়া বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ত্রুটিপূর্ণ পুরানো পদ্ধতিতে এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
২। প্রক্রিয়াজাত করণের অসুবিধাঃ এদেশে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে এখানে ফিনিশড লেদারের উৎপাদন অনেক কম হয়।
৩। নিম্নমানের চামড়াঃ এলোমেলো প্রজনন, উপযুক্ত খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের অভাব ইত্যাদি কারণে আমাদের দেশের গবাদিপশুগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের। এসব গবাদি থেকে প্রাপ্ত চামড়াও নিম্নমানের হয়ে থাকে।
৪। পুঁজি ও উদ্যোগের অভাবঃ আমাদের দেশের শিল্প উদ্যোক্তারা অন্যান্য শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে যতটা আগ্রহী চামড়া শিল্পে ততটা নয়।
৫। ঋণের অভাবঃ চামড়া শিল্পের সাথে জরিত মাঠ পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা দরিদ্র। কিন্তু চামড়া স্পর্কিত কাজের জন্যে এখানে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তারা এ ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।

৬। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবঃ এদেশে কাঁচা চামড়া পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব দেখা যায়। ফলে চামড়া উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

৭। আধুনিক চামাড়া কারখানার অভাবঃ অপ্রতুল পুঁজির কারণে এদেশে এ যাবৎ বড় ধরনের কোন আধুনিক চামড়া কারখানা গড়ে উঠেনি। বিদ্যমান চামড়া কারখানাগুলোতে প্রাচীন ও ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে চমড়া পরিশোধন ও পক্রিয়াজাতকরণ চলে। ফলে ফিনিশ্‌ড চামড়া উন্নত মানের হয় না।

৮। পশু পালনে অনীহাঃ পশুখাদ্যের অভাব, পশুর অধিক দাম, চারণভূমির সীমাবদ্ধতা, পশুর রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধা ইত্যাদি কারণে এখানে পশু পালনে অনীহা দেখা যায়। ফলে চামড়া যোগান অনিশ্চিত ও অনিয়মিত হয়।

৯। গবাদিপশু নিধনঃ এদেশে সর্বত্রই যথেচ্ছা ও ব্যপকভাবে গবাদিপশু জবাই চলে। বিশেষ করে পত্যেক বছর ঈদ-উল আযহার সময় একদিনেই প্রাপ্ত বিপুল পরিমান কাঁচা চামড়া সুষ্ঠু উপায়ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায় না।

উল্লেখিত বিভিন্ন কারণে এদেশে চামড়া শিল্পের কাঙ্খিত উন্নয়ন ঘটে নি।

ঙ) তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাঃ

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কতকগুলো সমস্যা লক্ষ্য করা যায়:

১। দেশীয় বস্ত্র শিল্পের অনুন্নতিঃ বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের অনুন্নতির ফলে পোশাক শিল্পে ব্যবহারযোগ্য উন্নতমানের কাপড় তৈরি হয় না। এ কারণে এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব কাপড় ও অন্যান্য উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

২। রপ্তানি কোটার অবসান ও রপ্তানি হ্রাসঃ ২০০৪ সালের শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয়ন দেশগুলো নির্দিষ্ট কোটার অধীনে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি করতো। কিন্তু গ্যাট চুক্তির অধীনে ২০০৫ সাল থেকে উক্ত কোটা ব্যবস্থা অবসানের ফলে সাময়িকভাবে আমাদের পোশাক রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পেলেও তা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। দক্ষ শমিকের অভাবঃ এদেশের পোশাক শিল্পে কর্মরত প্রায় ৮০ ভাগ শ্রমিকই গ্রাম থেকে আগত ও অদক্ষ মহিলা। দক্ষ শ্রমিকের অভাবে আমাদের তৈরি পোশাকের গুনগতমান অন্যান্য দেশের তুলনায় নিচু।

৪। ঋণের অভাবঃ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধার অভাব রয়েছে।

৫। দেশি-বিদেশি এজেন্টঃ এদেশের পোশাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ও পোশাক রপ্তানির প্রক্রিয়ায় দেশি-বিদেশি দালাল বা এজেন্ট মধ্যস্ততা করে। এজন্য আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৬।নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতাঃ এদেশের অধিকাংশ পোশাক কারখানা নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতায় চলে। অদক্ষ শ্রমিক, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কাঁচামাল প্রাপ্তিতে সমস্যা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি কারণগুলো নিম্নউৎপাদন ক্ষমতার জন্য দায়ী।

৭। বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিয়মঃ প্রকট বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে এদেশের পোশাক শিল্পের উৎপাদান ও উন্নয়ন যথেষ্ট ব্যহত হয়।

৮। উন্নত প্রযুক্তির অভাবঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ পোশাক কারখানায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত না হওয়ায় তৈরি পোশাকের গুনগত মান যথেষ্ট উন্নত হচ্ছে না।

৯। কাজের প্রতিকূল পরিবেশঃ এদেশের অধিকাংশ পোশাক কারখানায় কাজের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তারা নানা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

১০। রপ্তানিতে বিলম্বঃ কাঁচামাল আমদানির সমস্যা, পরিবহন জটিলতা, শুল্কের ঝামেলা প্রভৃতি কারণে পোশাক রপ্তানিতে বিলম্ব হয়। এ কারণে অনেক সময় আমদানিকারীদের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল করা হয়।

১১। রাজনৈতিক অস্থিরতাঃ রাজনৈতিক সংঘাত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ইত্যাদি কারণে পোশাক শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং রপ্তানি হ্রাস পায়।

বাংলাদেশে রপ্তানিমূখী শিল্পব্যবস্থার সমস্যার সমাধান :

ক) পাট শিল্প উন্নয়নের উপায়ঃ

পাট শিল্পের সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমে এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়।

১। পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাটকলগুলোর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি,উৎপাদন ক্ষমতার সার্বিক ব্যবহার এবং খুচরা যন্ত্রাংশের অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২। পাটকলসমূহের শ্রম অসন্তোষ দূর করার জন্য শ্রম আইনের পুনর্বিন্যাস এবং উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ও নিয়মিত সরবরাহ।
৩। পাটজাত দ্রব্যের নতুন সামগ্রী প্রবর্তন করা দরকার। সেই সঙ্গে প্রয়োজন লাভজনক ও নির্ভরযোগ্য বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
৪। বৈদেশিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও তা ধরে রাখার জন্য পাটজাত দ্রব্যের গুনগত মান বৃদ্ধি,উৎপাদন ব্যয়হ্রাস এবং চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানি দ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৫। কাঁচা পাট বা পাটজাত দ্রব্যের যোগান খুব কমে গেলে পাট চাষী ও পাট কলগুলোকে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৬। কাঁচা পাটের উপযুক্ত দাম নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করা। সাথে সাথে দরকার পাটের সমবায় বিপণন ব্যবস্থা ও সরকার কর্তৃক পাট ক্রয় ব্যবস্থা চালু রাখা।
৭। দেশের মধ্যে পাটকলসমূহের যন্ত্রাংশ তৈরির সুযোগ বাড়ানো। সাথে সাথে পাটকলগুলোর সামগ্রিক উৎপাদন-কৌশল ও প্রযুক্তি গত উন্নয়ন ঘটানো দরকার।
৮। পাট চাষীদেরকে স্বল্প সুদের হারে ঋণ প্রদান করা।
৯। পাট ব্যবসায়ে নিয়োজিত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ।

খ) বস্ত্র শিল্প উন্নয়নের উপায়

বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার:
১। বস্ত্রকলগুলোর আধুনিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানির ব্যবস্থা গ্রহন।
২। দেশে বেশিসংখ্যক সুতা ও কাপড় কল স্থাপন।
৩। দেশে উন্নতমানের তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে বিদেশ থেকেও উন্নতমানের তুলা আমদানির ব্যবস্থা গ্রহন।
৪। উৎপাদিত বস্ত্রের মান উন্নয়ন।
৫। রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্রের মান উন্নয়ন।
৬। এ শিল্পের জন্য সংরক্ষণনীতি গ্রহন এবং আমদানি নীতির যৌক্তিকীকরণ।
৭। বস্ত্র শিল্পে কর্মরত কারিগর ও শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৮। বস্ত্রশিল্পের জন্য সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণের যোগান বৃদ্ধি।
৯। বেসরকারি খাতে সুতা ও বস্ত্রকল স্থাপনের জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

গ) চা শিল্পের উন্নয়ণের উপায়:

বাংলাদেশের চা শিল্পের উন্নয়ণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার:
১। সেচ ব্যবস্থা: অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর না করে উন্নত ও পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
২। বিনিয়োগ বৃদ্ধি: চা শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ও মূলধন সরবরাহ করতে হবে।
৩। উন্নত বীজ ও সার: চা এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত বীজ ও সারের যোগান বাড়াতে হবে।
৪। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি: চা চাষ ও তা প্রক্রিয়াজাতকরণে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। এ জন্য শ্রমিকের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
৫। একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি: চা চাষে উন্নত প্রযুক্তি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একর প্রতি ফলন বাড়তে হবে। তাহলে চা এর দাম কমবে।
৬। চা এর গুনগত মান বৃদ্ধি: অন্যান্য দেশের চা এর গুনগত মানের সাথে তাল-মিলিয়ে আমাদের চায়ের গুনগত মান বাড়াতে হবে।
৭। উন্নত প্যাকিং ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা: উন্নত প্যাকিং ও আধুনিক পদ্ধতিতে চা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮। কার্যকর ও সুষ্ঠু চা নীতি: চা এর উৎপাদন ও বাজার জাত করার জন্য কার্যকর ও সুষ্ঠু চা নীতি প্রণয়ণ করা দরকার।
৯। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা: চা এর উৎপাদন ও বাজারজাত করনের জন্য কার্যকর ও সুষ্ঠু চা নীতি প্রণয়ন করা দরকার।

ঘ) চামড়া শিল্পের উন্নয়নের উপায়:

আমাদের চামড়া শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর আশু সমাধান একান্ত কাম্য। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহন করা যায়।

১। চামড়া ব্যবসায়ীদেরকে স্বল্প সুদের হারে ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা।
২। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন।
৩। চামড়াজাত দ্রব্যের জন্য দেশের বাইরে নির্ভরযোগ্য বাজার অনুসন্ধান।
৪। ফিনিশ্‌ড চামড়ার গুনগত মান উন্নয়নকল্পে গবেষণা ব্যবস্থা।
৫। চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন।
৬। চামড়া জাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ দানের ব্যবস্থা গ্রহন।
৭। ছোট ছোট ট্যানারিগুলোর জন্য ফিনিশিং ফ্যাসিলিটি সেন্টার চালু।
৮। চামড়া শিল্পে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহন।
৯। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চামড়াজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস।
১০। দেশের বাইরে চামড়া পাচার রোধ।
১১। ঈদের দিন বিপুল যোগানের কারণে কাঁচা চামড়ার দাম খুব কমে গেলে এর যোগানদানকারীদেরকে ভর্তূকি প্রদানের ব্যবস্থা।

ঙ) তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নের উপায়:

বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি অর্জনে তৈরি পোশাক শিল্প মূখ্য ভূমিকা রাখে। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে পোশাক শিল্পের ক্রমাগত উন্নয়ন সাধন করা যায়:

১। তৈরি পোশাকের মান উন্নয়ন: আমদানিকারক দেশগুলোর চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের মান উন্নয়ন করতে হবে। তাহলে বিশ্ব বাজারে আমাদের এ শিল্পের অবস্থান আরও সুসংহত হবে।

২। তৈরি পোশাক আইটেম বৃদ্ধি: প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের আইটেম বাড়াতে হবে। তাহলে কোটা না থাকা অনেক আইটেমের রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে।

৩। বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন: বর্তমানে এ দেশের পোশাক শিল্পের ব্যবহার্য মোট কাপড়ের প্রায় ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এ আমদানি হ্রাসের জন্য দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৪। প্রযুক্তি উন্নয়ন: তৈরি পোশাকের মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। বিদেশি প্রযুক্তি ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে হবে।

৫। পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা: বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রয়োজনে এ শিল্পের জন্য একটি স্বতন্ত্র ঋণ কাঠামো কার্যকর করতে হবে।

৬। অন্যান্য কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি: তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল যেমন- সুতা, তুলা, রং মেশিনের যন্ত্রাংশ প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে। তাহলে এ শিল্পের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং কম দামে পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

৭। এজেন্টদের দৌরাত্ম হ্রাস: পোশাক শিল্পে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী এজেন্টদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করতে হবে। এর ফলে প্রকৃত ব্যবসায়িগণ লাভবান হবেন এবং অবাঞ্ছিত অসুবিধা দূর হবে।

৮। শ্রমিকের প্রশিক্ষণ: পোশাকশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। এর ফলে পোশাকের গুনগতমান ও উৎপাদন বাড়বে।

৯। শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি: আমাদের তৈরি পোশাকে যতটা মূল্য সংযোজন হয় তার প্রায় ৬০ ভাগেরও বেশি শ্রমিকের শ্রম থেকে আসে। অথচ এ মূল্য সংযোজনের মাত্রা প্রায় ২৫ ভাগ শ্রমিক কে দেওয়া হয়। তাই এ শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ালে কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়বে এবং কাজের দক্ষতা ও উৎপাদন বাড়বে।

১০। বিদেশি বিনিয়োগের জন্য সুবিধা দান: অন্যান্য খাতের মতো পোশাক শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। তাহলে দেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ

১। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানিমূখী শিল্প সমূহের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২। এ শিল্পগুলোর উন্নয়নের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- রপ্তানিমূখী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এবং এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌছতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে পাটজাত দ্রব্য নিয়ে কোন দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন?
ক) ভারত, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল
খ) চীন, আফগানিস্তান, ইরান
গ) যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পোল্যান্ড
ঘ) সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত

২। গ্যাট চুক্তির অধীনে বাংলাদেশে রপ্তানী কোটা অবসান হয় কত সালে?
ক) ২০০৩ খ) ২০০৭ গ) ২০০৫ ঘ) ২০০৮

৩। কোনটি উৎপাদন বৃষ্টিপাতের উপর বেশি নির্ভরশীল?
ক) চা খ) পাট গ) বস্ত্র ঘ) সবগুলো

৪। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানিমূখী শিল্পের প্রয়োজনীয়তাগুলো কি কি?
i. দেশীয় শিল্পের প্রসার
ii. দক্ষতা বৃদ্ধি
iii. সম্পদের পূর্ন ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। রপ্তানিমূখী শিল্প ব্যবস্থার অসুবিধাগুলো কি কি?
i. আমদানি বিকল্প শিল্পের সমস্যা
ii. বহুজাতিক সমস্যাসমূহের শোষনের স্বীকার
iii. উন্নতদেশসমূহের কঠোর নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৩.৪ আমদানি বিকল্পন শিল্প
Import Substitution Industries

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- আমদানি বিকল্পন শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে আমদানি বিকল্পন শিল্পায়নের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে আমদানি বিকল্পন শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমদানি বিকল্পন শিল্পের উদ্দেশ্যাবলী

অনুন্নত দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের অধিকাংশই এখনো বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। ফলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়, লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দেখা দেয়।একটি দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে আমদানি বিকল্প ও রপ্তানি ভিত্তিক শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

আমদানি বিকল্পন শিল্প বলতে কোন একটি দেশ বিদেশ থেকে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি করে, সে সমস্ত দ্রব্য আর আমদানি না করে নিজস্ব প্রযুক্তি দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনকেই বুঝায়।

নিম্নে আমদানি বিকল্পন শিল্পের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল:

১। এ শিল্পে যতদূর সম্ভব দেশীয় কাঁচামাল, নিজস্ব প্রযুক্তি ও শ্রমঘন উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। যাতে এ শিল্প স্থাপনের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে না হয়।

২। আমদানি-বিকল্পন শিল্পে কেবল আমদানিকৃত দ্রব্যের মতো অথবা তার নিকট বিক্রয় দ্রব্য উৎপাদন করা।

৩। এ শিল্পের দ্রব্য কেবল অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন করা।

৪। প্রয়োজনে এ শিল্প সরকার প্রদত্ত সংরক্ষণ সুবিধা পেয়ে থাকে।

৫। এ শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, অর্জন নয়।

বাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের সমস্যা সমূহ

বাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্প ব্যবস্থা গ্রহন করা খুবই জরুরি। কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও কতিপয় বাধা রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্পনীতি গ্রহনের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ আলোচনা করা হল:

১। অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্য উৎপাদন: আমদানি বিকল্পন শিল্প নীতি গ্রহন করা হলে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের সম্ভাবনা থেকে যায়। অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্য তৈরি করে চাহিদা সৃষ্টি করা হলে আমাদের দরিদ্র জনগণের আয়ের একটি বৃহৎ অংশ এর পেছনে ব্যয় হয়ে যাবে। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার আমাদের মূলধন গঠন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

২। নিম্ন পণ্যমান: আমদানি বিকল্পন শিল্প শুরু থেকেই বিভিন্ন সংরক্ষণজনিত সুবিধা ভোগ করে। তাছাড়া এক সকল শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজারও নির্ধারিত থাকে বলে পণ্যের মান নিয়ে ততটা ভাবতে হয় না। ফলে এ অবস্থায় নিম্নমানের পণ্য উৎপাদনের সম্ভবনা থাকে না।

৩। বহুজাতিক কোম্পানির দৌরাত্ম: বাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্প ব্যবস্থা চালু হলে দেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর দৌরাত্মও বেড়ে যাবে। এতে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হলেও লাভের ফসল কোম্পানিগুলো নিজের দেশেই নিয়ে যায়। সুতরাং, এ থেকে আমাদের দেশ খুব একটা লাভবান হয় না।

৪। অবকাঠামো গত অসুবিধাঃ বাংলাদেশে এখনও সব ধরনের ভারী শিল্প স্থাপন উপযোগী অবকাঠামো গড়ে উঠেনি। তাছাড়া এ ধরনের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। প্রাথমিক অবস্থায় ভারি শিল্প স্থাপনের পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। আমাদের অর্থনীতি এখনো এই ধরনের ব্যায় বহন করার মত শক্তিশালী হয়নি।

৫। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতাঃবাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্পনীতি গ্রহন করা হলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য, খুচরা যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ইত্যাদি বহুল পরিমাণে আমদানি করতে হবে। ফলে আমদানি বিকল্পন শিল্পনীতি গ্রহন করা হলে চূড়ান্ত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পেলেও পণ্য তৈরির জন্য অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করতে গিয়ে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা না কমে বরং বেড়ে যায়।

আমদানি বিকল্পন শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাঃ নিম্নে বাংলাদেশে রপ্তানিমূখী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো-

১। দেশীয় শিল্পের প্রসারঃ রপ্তানিমূখী শিল্পের দ্রব্যসমূহের বাজার হল আন্তর্জাতিক বাজার। এই দ্রব্যসমূহের ক্রেতার সংখ্যা থাকে অনেক। এতে একদিকে যেমন তাদের উৎপাদন ব্যায়ের স্শ্রয় হয় অন্যদিকে বিক্রয়ও অনেক বেশি হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রপ্তানিমূখী শিল্পের ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটে।

২। দক্ষতা বৃদ্ধিঃ রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগতার লিপ্ত হয়। এতে প্রতিষ্ঠান গুলোর দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

৩। সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারঃ বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম হলেও আমাদের রয়েছে শিল্পোৎপাদন উপযোগী প্রচুর কাঁচামাল। কিন্তু মূলধনের অভাবে আমাদের দেশের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। বিদেশি সহায়তায় দেশে রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হলে আমাদের দেশীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৪। বেকার সমস্যা হ্রাসঃ বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। দেশীয় সম্পদের ব্যবহার করে এদেশে শ্রমবহুল রপ্তানিমূখী শিল্পোৎপাদন শুরু করলে দেশের বেকার সমস্যা বহুল অংশে হ্রাস পাবে।

৫। উৎপাদন ব্যায় হ্রাসঃ রপ্তানিমূখী শিল্পের ক্ষেত্রে যে দেশ যে শিল্প উৎপাদনে কাঁচামাল,শ্রমিক ইত্যাদি দিক থেকে অধিকতর সুবিধা ভোগ করে সে দেশ সেই শিল্প উৎপাদন করে। এতে শিল্পোৎপাদনের ব্যায় বহুলাংশে হ্রাস পায়।

৬। বৈদেশিক ঋণের বোঝা হ্রাসঃ বাংলাদেশ ঋণভারে জর্জরিত একটি দরিদ্র দেশ। দেশে রপ্তানিমূখী শিল্পোৎপাদন করা সম্ভব হলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়বে এবং বৈদেশিক ঋণের বোঝা হ্রাস করা সম্ভব হবে।

৭। কৃষির উন্নয়নঃ আমাদের দেশের বাজার সীমিত বিধায় কৃষকগন শিল্পের কাঁচামাল বিক্রয় করে খুব একটা লাভবান হয় না। এছাড়া এ ধরনের কাঁচামালের রপ্তানির বাজার সবসময় উঠানামা করে। কিন্তু দেশে রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান করা হলে আমাদের কৃষক তাদের উৎপাদিত কাঁচামাল বিক্রয়ের নিশ্চয়তা পাবে। এতে কৃষির উন্নতি হবে।

৮। বানিজ্য ঘাটতি হ্রাসঃ বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশে অব্যাহত বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করা দরকার। আমদানি হ্রাসের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের প্রয়োজন আছে।

৯। মূলধন দ্রব্য উৎপাদনঃ উন্নয়নশীল দেশ সাধারণত মূলধন দ্রব্য বেশি আমদানি করে। অতএব আমদানি বিকল্প শিল্পায়ণ গ্রহন করা হলে দেশের ভেতরে মূলধন দ্রব্য উৎপাদিত হয়। ফলে উন্নয়নের গতি সহজ ও ত্বরান্বিত হয়।

১০। স্বনির্ভরতা অর্জনঃ আমদানি-বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম ভোগ্যপণ্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ফলে শিল্প পণ্যের দিক থেকে দেশে স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায়।

১১। বাজারের নিশ্চয়তাঃ বাংলাদেশসহ যেসব দেশে জনসংখ্যা বেশি সেখানে জনগনের প্রয়োজন অনুযায়ী অসংখ্য প্রকার পণ্য আমদানি করতে হয়। এ অবস্থায় দেশে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করা হলে এ সব শিল্পপণ্যের বাজারের নিশ্চয়তা থাকে।

১২। শিল্পের বিক্রয় কেন্দ্রীকরণঃ আমদানি বিকল্প শিল্পায়নে বিভিন্ন রকম শিল্প স্থাপন করা যায়। ফলে দেশে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং সমগ্র শিল্পখাতের প্রসার ঘটে।

এসব বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমদানি বিকল্পন শিল্পায়ন নীতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ

১। বাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্পের বর্ণনা করুন।
২। আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায় বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে বেশী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পরিবারের সদস্যদের সহযোগীতায় যে শিল্প পরিচালিত হয় তাকে কী শিল্প বলে?
ক) অতিক্ষুদ্র শিল্প খ) ক্ষুদ্রশিল্প গ) কুটির শিল্প ঘ) মাঝারি শিল্প

২। বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা হ্রাসের অন্যতম কারণ কোনটি?
ক) পাটের নিম্ন মান খ) পাটের স্বল্প যোগান
গ) পাটের উচ্চ মূল্য ঘ) সিনথেটিক ফাইবার উৎপাদন

৩। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধাগুলো কী?
i. স্বল্প পুঁজি ii. শ্রমঘন উৎপাদন iii.স্বল্প উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪।বাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের গুরুত্ব হলো–
i. শিল্পখাতের বিকেন্দ্রীকরণ ii. বানিজ্য ঘাটতি হ্রাস iii. আমদানি হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। পোশাক শিল্পে উন্নতি করতে হলে–
i. দেশীয় বাজারের কাপড় ক্রয় করতে হবে ii. শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে
iii. নতুন নতুন বাজার খুঁজতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। কোরবান সাহেব তার কারখানায় বিভিন্ন শাখায় আলাদা শ্রমিক নিয়োগ করেছেন কারণ–
i. পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি করবেন বলে ii.অল্প সময়ে কাজ শেষ করবেন বলে
iii. ব্যবসায়ে ঝুঁকি এড়াবেন বলে
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। কৃষির পাশাপাশি এদেশে শিল্পখাতেও উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজস কারণ শিল্পোন্নয়ন বাংলাদেশের–
i. জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে ii. জীবন যাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন ঘটায়
iii. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৩.৫ শিল্প মূলধন
Industrial Capital

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- শিল্প মূলধন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে মূলধনের অভাবে কারন বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিল্প মূলধন গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শিল্প মূলধনের সংজ্ঞা:

কোন কারখানা স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য যে মূলধন (কলকারখানার যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জ্বালানি ইত্যাদি) প্রয়োজন হয় তাকে শিল্প মূলধন বলা হয়। কোন দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য শিল্প মূলধন অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ শিল্প মূলধন ব্যতীত দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব নয়। শিল্প মূলধনকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী মূলধন এবং (২) স্বল্পমেয়াদী বা চলতি মূলধন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গৃহ নির্মাণ,যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকৃতি কাজের জন্য যে মূলধন প্রয়োজন হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী মূলধন বলা হয়। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাকে স্বল্পমেয়াদী মূলধন বলা হয়। দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য উভয় প্রকার মূলধনই একান্ত আবশ্যকীয়। অতএব কোন দেশের শিল্পায়ন মূলত শিল্প মূলধনের যোগানের ওপরই নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে শিল্প মূলধনের অভাবের কারণ:

শিল্প মূলধনের অভাবের কারণে বাংলাদেশের শিল্পায়ন দ্রুততার সাথে করা সম্ভব হচ্ছে না। নিচে বাংলাদেশে শিল্প মূলধনের অপ্রতুলতার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

১। স্বল্প মাথাপিছু আয়: বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র বলে তাদের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। ফলে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর তাদের হাতের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে না। এ জন্য এখানে সঞ্চয়ের পরিমাণ খুব কম। ফলে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন গঠনের হার সন্তোষজনক নয়।

২। অনুন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা খুব উন্নত নয়। এখনও দেশের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। ফলে গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত লোকজন তাদের স্বল্প সঞ্চয় ব্যাংকে জমা দিতে পারে না। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণের সঞ্চয় একত্রীকরনের মাধ্যমে শিল্প মূলধন গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩। অনুন্নত শেয়ার বাজার: সুসংগঠিত শেয়ার বাজারের মাধ্যমে শিল্প মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশে সুসংগঠিত শেয়ার বাজারের একান্ত অভাব রয়েছে। এর ফলে শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৪। অনুন্নত মুদ্রা বাজার: বাংলাদেশের মুদ্রাবাজার সুসংগঠিত নয়। ফলে পর্যাপ্ত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবে শিল্পঋণের যোগান খুব কম। এখানকার জনসাধারণ বাণিজ্যিক জ্ঞানের অভাবের কারণে ঋণপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থবিনিয়োগ করতে খুব উৎসাহবোধ করে না।

৫। অনুন্নত বীমা ব্যবস্থা: শিল্প মূলধনের অন্যতম যোগানদানকারী হলো বীমা সংস্থাসমূহ। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে বীমা সংস্থাসমূহ শিল্প মূলধনের অধিকাংশ যোগান দিয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের বীমা সংস্থাসমূহ এখনও অনুন্নত স্তরে রয়েছে।

৬। শেয়ার বিক্রয়ের অসুবিধা: অধিক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে শিল্প ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশে ঋণপত্র ও শেয়ার সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাবের কারণে শেয়ার বিক্রয়ের পরিমাণ খুব কম।

৭। ব্যবসায়ী পুঁজির প্রাধান্য: বাংলাদেশের জনগণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগে অধিক আগ্রহী। এর ফলে শিল্প খাতে মূলধনের অভাব দেখা দেয়।

৮। শিল্প ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা: বাংলাদেশে শিল্প ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা বিরাজমান। বাংলাদেশে যে তিনটি বিশেষ শিল্প ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা এবং বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থারয়েছে তারা পর্যাপ্ত শিল্প মূলধন সরবরাহ করতে পারে না।

৯। কারিগরি ঋণের অভাব: শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং এর জন্য দরকার কারিগরি ঋণের। কিন্তু বাংলাদেশে কারিগরি ঋণের একান্ত অভাব রয়েছে।

১০। বাণিজ্যিক ব্যাংক এর ঋণদান নীতি: বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ঋণদানের পরিবর্তে ব্যবসায়িক কাজে স্বল্পকালীন ঋণদানের নীতি অনুসরণ করে। এর ফলেও শিল্প মূলধনের ঘাটতি দেখা দেয়।

শিল্প মূলধন গঠনের উপায়

বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য শিল্প মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। বাংলাদেশে শিল্প মূলধন বৃদ্ধি করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে:

১। সঞ্চয়ের পরিমান বৃদ্ধি: বাংলাদেশে সঞ্চয়ের পরিমান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জনগনের ভোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকারের উচিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে সঞ্চয় হার বৃদ্ধি পায়।

২। অধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন: দেশে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক সংখ্যায় ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি স্থাপন করা প্রয়োজন। দেশে গ্রামীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যক ব্যাংকিং এর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৩। অধিক সংখ্যায় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন: দেশে অধিক সংখ্যক বিশেষায়িত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি হলে শিল্প মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পাবে।

৪। বেকার সমস্যা সমাধান: দেশে বেকার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শ্রম শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের দ্বারা জনগনের আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ফলে জনগনের আয় বৃদ্ধি হলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাবে।

৫। মূলধন বাজারে উন্নতি সাধন: দেশের মূলধন বাজারকে সুগঠিত করতে হবে। মূলধন বাজার সুসংগঠিত হলে শিল্প মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পাবে।

৬। ঘাটতি ব্যায় নীতি অবলম্বন: সরকার ঘাটতি ব্যায় নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে শিল্প মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করতে পারে। তবে ঘাটতি ব্যায় নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৭। সরকারি প্রয়াস: সরকারী প্রয়াসের মাধ্যমে শিল্প মূলধন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকার অধিক হারে কর ধার্য এবং ব্যায় সংকোচন নীতি অবলম্বন দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করে শিল্প মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ

১. শিল্প মূলধন কী? এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।
২. বাংলাদেশে মূলধনের অভাবের কারণ বর্ণনা করবেন।
৩. বাংলাদেশে শিল্পমূলধন গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করবেন।

সারসংক্ষেপ

- কোন দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য শিল্প মূলধন অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু মূলধনের অপ্রতুলতার কারনে বাংলাদেশের শিল্পায়ন দ্রুততর করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারি প্রয়াসের মাধ্যমে শিল্প মূলধন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকার অধিক হারে কর ধার্য এবং ব্যয় সংকোচন নীতি অবলম্বন দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করে শিল্প মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে। এ ব্যতীত সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হতে শিল্প ঋণ গ্রহন করে শিল্প মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সাধারণত শিল্পখাত বলতে কোন খাতটিকে বোঝায়?

ক) কৃষিখাত খ) উত্তোলন খাত গ)ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ঘ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

২। নিচের কোনটি কুটির শিল্প?

ক) পাট শিল্প খ) প্লাস্টিক শিল্প গ) মৃৎ শিল্প ঘ) সাইকেল শিল্প

৩। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধাগুলো কী?

i. স্বল্প পুঁজি ii. শ্রমঘন উৎপাদন iii স্বল্প উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ৩.৬ বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা
Role of Public and Private Sector in Industrilization of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বেসরকারি খাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশে শিল্পায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা:

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। তাই এ দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী বেসরকারি খাত। তাছাড়া স্বাধীনতার পর বড় বড় সকল শিল্প কলকারখানা জাতীয়করন করা হয়। কিন্তু এ সকল শিল্প আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য বেসরকারি খাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১। শিল্পায়নের সূচনা: উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা শিল্পায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য অর্থনীতিবিদ স্যুমপিটার তাদেরকে শিল্পায়নের সূচনকারী এবং চালিকা শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। বেসরকারি উদ্যোক্তারা মুনাফা-অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে বিভিন্ন শিল্পের প্রসারের যে উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে তা কেবলমাত্র বেসরকারী উদ্যোক্তারাই করতে পারে।

২। শিল্পায়নের গুরুত্ব: কোন দেশের শিল্পায়নে বেসরকারি খাতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ কথা সত্য যে, উদ্যোক্তারা সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জনের তাগিদে কল-কারখানা গড়ে তোলে। তবে এটি বাস্তব যে তাদের এ কাজ কর্মের ফলেই দেশে শিল্পোন্নয়ন ঘটে। সুতরাং আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুততর করতে হলে উদ্যোক্তাদেরকে অবশ্যই এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩। ব্যাপক ভিত্তিতে অধুনিক শিল্পখাত সৃষ্টি: কোন দেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যাপক ভিত্তিতে আধুনিক শিল্পখাত সৃষ্টির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তবে জনবহুল ও মূলধন ঘাটতির দেশে দুর্বল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য শিল্পোন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ে সরকারের বদলে বেসরকারি উদ্যোক্তরাই অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে। শিল্পোন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোগ যত বাড়বে এসব আধুনিক শিল্পের তত প্রসার ঘটবে।

৪। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি: শিল্পোন্নয়ন দেশে অধিক সংখ্যায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। স্বল্প সম্পদ নিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার তাদের প্রতিষ্ঠান এমন ভাবে পরিচালিত করতে পারে যাতে সর্বাধিক সংখ্যক মুনাফা অর্জিত হয়। এ দেশে বেসরকারি খাতে অধিক সংখ্যায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তুললে তা শিল্পায়নের গতি দ্রুততর করবে।

৫। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের গুরুত্ব আরও দুদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বেসরকারি খাত জাতীয় আয়ে সিংহভাগ অবদান রাখে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীলদেশে এর হার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। দ্বিতীয়ত, দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৯০ ভাগ বেসরকারী খাতে হয়। দেশের জনগোষ্ঠির জীবিকা অর্জনের জন্য বেসরকারি খাতের উপর নির্ভর করায় এ খাতে নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে ওঠার সাথে সাথে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সূযোগ সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারি খাতের গুরুত্ব

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে সরকারি বেসরকারি খাতের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষণীয়। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় খাতের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার ফলে ১৯৭২ সালে দেশের বড় বড় কল-কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে

যদিও মুক্তবাজার অর্থনীতি চর্চা করা হচ্ছে এবং অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের ভূমিকা বাড়ানো হচ্ছে। তারপরও আমাদের দেশে এমন কিছু ভারি শিল্প রয়েছে যা কেবল সরকারি খাতেই পরিচালনা করা সম্ভব।

১। **মূলধন গঠন:** দ্রুত শিল্পায়নের জন্য মূলধন গঠন অপরিহার্য। এজন্য প্রয়োজন সঞ্চয় সৃষ্টি,সঞ্চিত অর্থের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও তা উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। সরকার সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক,বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা প্রভৃতি জনসাধারণের সঞ্চয় ও সম্পদ সমাবেশ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এসব সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্পখাতে মূলধন সরবরাহ করে এবং ক্ষেত্রে বিশেষে আর্থিক ও কারিগরি পরামর্শও প্রদান করে।

২। **মৌলিক বুনিয়াদ সৃষ্টি:** যে কোন দেশের শিল্পায়ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ সৃষ্টির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পর্যাপ্ত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন,পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ও পরিবহন সুবিধার উন্নয়ন ,রেললাইন বিমান ও সামুদ্রিক বন্দর নির্মাণ,ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা,টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করা প্রভৃতি দেশের শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সুত্রে অনুন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর শিল্প প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি খাতের অনীহা কিংবা সম্পদের স্বল্পতার কারণে একমাত্র সরকারকেই দেশে শিল্পায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়।

৩। **শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করণ:** দ্রুত শিল্পায়নের জন্য দেশে শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। এজন্য দেশে মৌলিক ও ভারী শিল্প গড়ে তোলা দরকার। এ ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের অভাবে সরকারকেই শূণ্যতা পূরণ করতে হয়। সামান্য হলেও বাংলাদেশ সরকারের সক্রিয় উদ্যোগের এ ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশে শিল্প ভিত্তি মজবুত করার জন্য লৌহ ও ইস্পাত,প্রাকৃতিক গ্যাস, সার তেল পরিশোধন ইত্যাদি শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলো না ঘটলে দেশে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনকারী বেসরকরি শিল্পগুলো দ্রুত গড়ে উঠত না।

৪। **বেসরকারি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান:** সরকারি খাতে ভারী ও মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে বেসরকারি খাতে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার পথে বিদ্যমান অনেক অন্তরায় দূর হয়। ফলে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর সরকারি খাত বেসরকারি খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী কিংবা প্রতিবন্ধক না হয়ে সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করে। সরকারি খাতে শিল্পে নিয়োজিত শিল্প-শ্রমিকেরা তাদের আয় দিয়ে যে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে তা সাধারণত বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়।

৫। **আয়তনজনিত সুবিধাদান:** যে সব শিল্পে আয়তন জনিত সুবিধার উৎপত্তি ঘটে, সেগুলো স্থাপনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন পরে এগুলো সরকারি খাতেই গড়ে ওঠা সম্ভব। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনে কিছু বৃহৎ শিল্প সরকারের মালিকানায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬। **আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস:** বাংলাদেশে অনেক অঞ্চল এখনও অনেক অনুন্নত। এসব অঞ্চলে মৌলিক বুনিয়াদের অভাবে বেসরকারি উদ্যোগে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই সরকারি উদ্যোগে এসব এলাকায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ স্থপানসহ কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

৭। **আমদানি বিকল্পায়ন ও রপ্তানি উন্নয়ন:** উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে শিল্পোন্নয়ন ব্যহত হয়। আমাদের পরিকল্পনায় শুরু থেকেই এ সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। এজন্য দেশে সেসব শিল্প গড়ে তোলা দরকার যেগুলো আমদানি বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন করতে ও বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের তূলনামূলক দক্ষতা বা পারস্পরিক গুরুত্ব

কোন দেশের অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা কেমন হবে তা মূলত নির্ভর করে দেশটিতে বিরাজমান অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর। স্বাধীনতার পরপর দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ফলে সরকারি খাতের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের তুলনামূলক বিচার করা হল:

১। **লাভ-লোকসান:** লাভ লোকসানের দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বিচার করা হয়। বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত বছরের পর বছর লোকসান দিচ্ছে। অপর দিকে বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলো বাজারে টিকে আছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য প্রবেশ করেছে।

২। অপচয়: সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি কর্মচারি বা আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হয় ফলে উপকরণসমূহের অপচয় হয়। কিন্তু বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ মালিক দ্বারা পরিচালিত হয় ফলে সর্বত্র থাকে দক্ষতার ছাপ। তাই অপব্যয় বা অপচয় কম হয়।

৩। উৎপাদন ব্যয়: বাংলাদেশে সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অদক্ষতার অনেক কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ হল অত্যাধিক উৎপাদন ব্যয়।

৪। **স্থাপন প্রক্রিয়া:** বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিক স্থাপন করে মুনাফার লক্ষ্যে। অপরদিকে সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপিত হয় দেশে জাতির প্রয়োজনীয়তা তথা কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে।

৫। দক্ষতা ও গতিশীলতা: বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনা করে দেখা যায় সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাতের শিল্পসমূহের দক্ষতা ও গতিশীলতা বেশি।

৬। গুনগত মান: বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদিত পন্যের গুনগত মান আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হতে হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনায় বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পন্যের গুনগত মান অনেক ভাল।

৭। **ট্রেড ইউনিয়ন:** বাংলাদেশের সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারি শ্রমিকনেতাদের দাপটে অনেক সময় উৎপাদন কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ট্রেড ইউনিয়নের আচরণ হয় গঠনমূলক।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাতের শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর ভূমিকা রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাংলাদেশের শিল্পায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করবেন।	

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সরকারি ও বেসরকারি খাত। যদিও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাত শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর ভূমিকা রাখছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন সালে দেশের বহু কলকারখানা জাতীয়করণ করা হয়?

ক) ১৯৭১ সালে খ) ১৯৭২ সালে গ) ১৯৭০ সালে ঘ) ১৯৭৪ সালে

২। বাংলাদেশে বেসরকারি খাত জাতীয় আয়ের কত অংশ অবদান রাখে?

ক) ৭০% খ) ৭৫% গ) ৮০% ঘ) ৮৫%

৩। বাংলাদেশে বেসরকারি খাত মোট কর্মসংস্থানের কত অংশ অবদান রাখে?

ক) ৭০% খ) ৮০% গ) ৯০% ঘ) ৮৫%

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। ড. আমিনুল হক একজন প্রখাত অর্থনীতিবিদ। তার মতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জন্য শ্রম নিবিড় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। দেশের কুটির শিল্পগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব।

ক) কুটির শিল্প কী?

খ) কুটির শিল্পের শ্রমিক কারা?

গ) ক্ষুদ্রশিল্পে সকর্মসংস্থানের উপায় বর্ণনা করুন।

ঘ) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। সালাম সাহেব তার এলাকায় একটি দিয়াশলাই কারখানা দেন। উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় জনগনের চাহিদা মেটায়। স্থানীয় এলাকার শিমুল গাছ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের শিল্প সম্প্রসারনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কতগুলো ক্ষুদ্র শিল্প এলাকা গঠন করা হয়েছে। এর ফলে দেশে শ্রম নির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ক) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কয় ধরনের শিল্প আছে?

খ) বাংলাদেশের শিল্পের ৪টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত শিল্পকে কোন ধরনের শিল্প বলা যাবে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) "বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন" উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৩.১:	১। ঘ	২। গ	৩। গ	৪। ঘ	৫। খ		
পাঠ ৩.২:	১। খ	২। গ	৩। খ	৪। গ	৫। ঘ	৬।খ	
পাঠ ৩.৩:	১। ক	২। গ	৩। ক	৪। খ	৫। ঘ		
পাঠ ৩.৪:	১। গ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। গ	৫। ঘ	৬। গ	৭। ঘ
পাঠ ৩.৫:	১। গ	২। গ	৩। ক				
পাঠ ৩.৬:	১। খ	২। গ	৩। গ				